ছোটদের জেনারেল

বখ্‌ত খান

আতোয়ার রহমান

ছোটদের জেনারেল বখ্‌ত খান

আতোয়ার রহমান

ই.ফা.বা. প্রকাশনা : ১৪৬১

ই.ফা.বা. গ্রন্থাগার : ৯২৩.৫

প্রথম প্রকাশ :

ভাদ্র ১৩৯৪

জিলহজ্জ ১৪০৭

আগস্ট ১৯৮৭

প্রকাশক :

অধ্যাপক আবদুল গফুর

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :

রফিকুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাই :

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

মূল্য : সতর টাকা মাত্র

ই. ফা. বা. ১৯৮৭-৮৮/প্র-৪২২৭/৫২৫০/১৪-৫-৯৪/৩১-৮-৮৭

CHHOTODER GENERAL BAKHT KHAN : The Life-sketck of General Bakht Khan a leader of the Revolution of 1857. written by Atoar Rahman and published by Prof. Abdul Ghafur, Director, Publications Islamic Foundation Bangladesh. August 1987

Price : Tk. 17.00, U.S. $: 1·00

প্রকাশকের কথা

১৮৫৭ সালের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, জেনারেল বখ্ত খান সেই অকুতোভয় ব্যক্তিত্বের একজন। তাঁর দেশ-প্রেম ও কর্ম নিষ্ঠা তাঁকে আমাদের জাতীয় বীরদের ইতিহাসে উজ্জ্বল রেখেছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা কম জানি, অনেকটা ভুলে যাওয়া তাঁর সংগ্রামের কাহিনী। আর এ সাথে এটাও উল্লেখ্য, '৫৭-এর মহা বিপ্লব সর্ব ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে অতীতে 'বিদ্রোহ' বলে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এভাবে বিষয় এবং ব্যক্তিত্ব দুটোকেই খাটো করে দেখা হয়েছে।

আমাদের জাতীয় জাগরণের জন্য ভাবী-কালের তরুণদের হাতে এ সংগ্রামের কাহিনী এবং নেতৃত্বের উদাহরণ তুলে ধরা জরুরী। জাতীয় এ দায়িত্বের দিকটি চিন্তা করে সুসাহিত্যিক আতোয়ার রহমান ছোটদের জেনারেল বখ্ত খান গ্রন্থটি লিখেছেন। এতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের জীবন গঠনের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাবে বলে আশা করি।

দুটি কথা

এখানে যাঁর কথা বলা হল, তিনি ছিলেন এক বীর সিপাহী। ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশকে ইংরেজ শাসন থেকে আযাদ করবার জন্যে সিপাহী আর জনসাধারণ এক সাথে হাতিয়ার হাতে তুলে নেন। সে সময়ে প্রথম দিকে কিছু দিন তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি।

হাল-হাতিয়ার, টাকা-কড়ি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির অভাবে সেদিনকার বিদ্রোহ সফল হয়নি। নেতাদের কিছু দোষ-ত্রুটিও ছিলো,—যা এই কাহিনীর নায়ক বখ্‌ত খানের মধ্যেও দেখা গেছে। কিন্তু তাঁর সততা নিয়ে কেউ কখনো কোন কথা তোলেনি। তিনি যে দেশকে তাঁর প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন, সারা অন্তর দিয়ে তার স্বাধীনতা চাইতেন, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে। বিদ্রোহের আগুন যখন নিবু-নিবু, জয়ের কোনো পথই খোলা নেই, তখনও তিনি আশা ছাড়েননি। এমন মানুষ কোন দেশেই বেশি দেখা যায় না।

দুঃখের বিষয়, এই আযাদী পাগল বীরের কথা আমাদের দেশের খুব কম লোকেই জানে। তাঁকে যেন আমরা ভুলেই গেছি। অথচ তাঁর কাছে আমাদের কতো ঋণ। তাঁর মতো মানুষের পথ ধরেই তো আমরা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হয়েছি। তাঁর কথা জানা তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনের কথা ভেবেই আমি তোমাদের জন্যে তাঁর কথা তুলে ধরলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-কাহিনী তোমাদের দেশপ্রেম আর স্বাধীনতা-প্রীতি গভীর করবে।

—আতোয়ার রহমান

সূচীপত্র

ছোটদের জেনারেল

বখ্‌ত খান

সারা ভারতের সিপাহ্‌সালার

সময়টা ১৮৫৭ সাল। জায়গা দিল্লী শহর।

শহরটার চারদিকেই এখন আগুন। কোথাও জ্বলছে তা দাউ দাউ করে, কোথাও বা ধিকি ধিকি।

কিন্তু কেন,—আগুন কেন ?

আগুন এই জন্যে যে, ইংরেজরা ভারতে এসেছিলো বাণিজ্য করতে। তারপর হয়ে বসে রাজা। তারা প্রথম রাজ্যি জয় করে ১৭৫৭ সালে, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্‌দৌলাকে হারিয়ে দিয়ে। সেই যুদ্ধের পর তাদের লোভ যায় বেড়ে। তারা দখল করতে থাকে একের পর এক আশপাশের রাজ্যিগুলো। তার ফলে একদিন সারা উপমহাদেশই চলে যায় তাদের দখলে।

দেশের মানুষ প্রথমে তাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপর আর তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝেই মাথা তোলে। কখনো এখানে, কখনো ওখানে। কিন্তু ইংরেজরা সব জায়গাতেই তাদের দমিয়ে দেয়।

শেষে একদিন দেশের সব মানুষ হয় একরোখা। বলাবলি করে, না, আর নয়। এবার একটা ভালো পথ চাই।

ঃ হ্যাঁ। ইংরেজদের আমরা এদেশ থেকে একদম তাড়িয়ে দেব, দেশকে স্বাধীন করবো।

ঃ কিন্তু কেমন করে ?

ঃ কেমন করে আবার ? দেশের সব্বাই এক জোট হয়ে।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। তারা এক জোটই হয়।

তার জন্যে প্রথম আয়োজনটা করে অবশ্যি ইংরেজদের ফৌজের দেশী সেপাইরা। তারপর তাদের সাথে হাত মেলায় আর সব মানুষ। তখন সারা-দেশে বিদ্রোহের ধোঁয়া উঠতে থাকে।

সেই ধোঁয়া থেকে ক্রমে রীতিমতো আগুন জ্বলতে শুরু করে। প্রথমে জ্বলে বহরমপুরে, তারপর ব্যারাকপুরে। কিন্তু ছোটো ছোটো। একদিনেই নিভিয়ে দেওয়ার মতো।

কিন্তু কিছুদিন পরই জ্বলে ওঠে বিরাট আগুন। মীরাট শহরে।

সে আগুন আর নেভানো যায় না। বরং তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন দিল্লীতে, পরদিন ফিরোজপুরে, তারপর মুরাদাবাদে, তার পরের দিন অন্য কোথাও।

হ্যাঁ, এই হল ১৮৫৭ সালের আগুন। আর, এরই শিখায় দিল্লী শহর গরম। যেমন ভেতরে, তেমনি বাইরে।

দিল্লী এখন বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি। স্বাধীন ভারতের রাজ-ধানী। এখানে স্বাধীন সম্রাট হয়ে বসেছেন মুঘল বংশের বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্। যিনি এতোদিন ছিলেন ইংরেজদের হাতে বন্দীর মতন।

বাদশাহ্র বয়স আশি ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীন সম্রাট হয়ে তিনি জোয়ানের মতোই খাটছেন। তাঁর ছুটোছুটির শেষ নেই, কাজকর্মের শুমার নেই।

তবু তিনি যেন সামাল দিতে পারেন না। ইংরেজরা বিদ্রোহীদের হাতে মার খেয়ে প্রথম দিকে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন তারা মার-মুখো। দিল্লীর কিছু জায়গা দখল করে বসে আছে। তাদের তাড়াতে হবে। তার জন্যে শহরে জুটেছে হাজার হাজার বিদ্রোহী। বাইরে থেকেও আসছে

অনেক। এতো লোককে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে সামলে রাখা, তাদের খাবার-দাবার, টাকাকড়ি আর হাতিয়ার যোগানো কি সোজা কথা?

এমনি সময় একদিন, জুলাই মাসের দু'তারিখে—কি হয়? না, তার সামনে এসে দাঁড়ান বাইরের এক বিদ্রোহী অফিসার। তিনি বাহাদুর শাহ্কে কুর্নিশ করে বলেন, শাহানশাহ্র জয় হোক।

বাহাদুর শাহ্ তাঁর কিছু কিছু খবর আগেই পেয়েছেন। বললেন, আপনিই তাহলে—

ঃ হ্যাঁ, জাঁহাপনা। বান্দা মুহাম্মদ বখ্ত খান। আমি আসছি বেরেলি থেকে। আমরা সেখানে বিদ্রোহ করেছি। বিদ্রোহ করেছে সারা রোহিলাখণ্ডের মানুষ।

ঃ আমি জানি।

ঃ বেরেলিকে আমরা রাজধানী করেছি। নতুন রোহিলাখণ্ড এখন আপনার অধীন। আর, বান্দা আপনার হুকুমবরদার। এজাজত পেলে দেশের একটু খেদমত করি।

ঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু আমাদের দশা যে এখন কেমন, তা নিশ্চয়ই জানেন।

ঃ তার জন্যে ভাবনা কি, জাঁহাপনা? আমার সঙ্গে ফৌজ আছে, চার দল পদাতিক। সাতশো ঘোড়সওয়ার, চৌদ্দটি হাতি।

ঃ কিন্তু শুধু ফৌজ দিয়ে তো লড়াই হয় না, মুহাম্মদ বখ্ত খান।

ঃ আর যা লাগে, তাও আমি কিছু কিছু এনেছি জাঁহাপনা। চার লাখ টাকা আর অনেক হাতিয়ার। এখন যদি হুকুম করেন, আমি বিদ্রোহীদের সব ভার নিতেও রাযী আছি।

বাদশাহ্ এবার ভালো করে বখ্ত খানের দিকে তাকালেন। মানুষটি



যদি হুকুম করেন আমি বিদ্রোহীদের সব ভার নিতেও রাজী আছি।

বুড়ো। বয়স পঁয়ষট্টির কম হবে না। কিন্তু শরীরটা রীতিমতো শক্ত। আর মনের জোর? তাও যে তাঁর আছে, তা তো কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। লড়াই তো এমনি লোকদের দিয়েই হয়।

তবু বাহাদুর শাহ্ একটু চুপ করে থেকে বলেন, বেশ।

তাঁর এই চুপ করে থাকবার কারণ,—তিনি এখন স্বাধীন সম্রাট, তবু নিজের থেকে কিছু করেন না। বিদ্রোহীদের কাজ-কর্ম চালাবার জন্যে তৈরি হয় এক সেপাই দরবার। বাহাদুর শাহ্ই তার কর্তা। তবু তাঁর যা কিছু করবার, সেপাই দরবারকে বলে-কয়ে করেন।

বখ্ত খানের কথাটা তিনি সেপাই দরবারে তোলেন।

দরবার বখ্ত খানের প্রস্তাবটা মেনে নেয়।

বাহাদুর শাহ্ তখন এক ফরমান জারি করেনঃ এখন থেকে বখ্ত খান হলেন বিদ্রোহীদের সিপাহ্সালার। সারা স্বাধীন ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ।

সেই সঙ্গে বখ্ত খানকে উপাধি দেন, 'সাহেব-ই-আলম বাহাদুর'। যাকে ইংরেজীতে বলে লর্ড গবর্নর জেনারেল,—বড়োলাট বাহাদুর। আর, তিনি এতোদিন ছিলেন ছোটো অফিসার, এবার তাঁকে করে নেন একদম জেনারেল।

নিয়ে,—তার হাতে যুদ্ধের সব ভার ছেড়ে দিয়ে, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

বাহাদুর শাহ্ তাঁকে পেয়ে সত্যি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু বাইরের লোকে হয় অবাক। তারা বলাবলি করে নানান কথা।

সে সবের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথাঃ এমন করে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, ইনি কে?

বেরেলিতে আগুন

যেমন কথা তুলেছিলো একদিন বেরেলির লোকেও। মে মাসের একত্রিশ তারিখে।

তখন চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। দিল্লী তো সরগরম। সেখানকার বিদ্রোহীদের সাথে ইংরেজদের একটা পাল্টা লড়াইও হয়ে গেছে। অথচ তখনও বেরেলিতে আছে শুধু ধোঁয়া।

লোকের কিন্তু আর এটা ভালো লাগে না। তারা বলাবলি করে, আমাদের কি এইভাবেই দিন যাবে?

ঃ তাই তো! মীরাটে আগুন জ্বলেছে এগারোই মে। তারপর পুরো তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল। তবু আমরা ছাড়ছি শুধু বরফের ধোঁয়া।

ঃ না, এবার একটা কিছু করতে হয়।

ঃ কিন্তু—সেটা করে কে?

ঃ কেন, সেপাইরা কিংবা নবাব সাহেব—

তাদের মুখের কথা মুখেই থাকে, হঠাৎ খবর আসে,—হয়ে গেছে, হয়ে গেছে।

ঃ কি হয়ে গেছে?

ঃ ইংরেজরা খতম।

লোকে এবার খুশিতে ফেটে পড়ে, কোথায়?

ঃ মিলিটারি ছাউনিতে।

অমনি সবাই ছুট দেয় ছাউনির দিকে।

সেখানে গিয়ে দেখে, হ্যাঁ; সত্যিই ইংরেজরা খতম। তবে, জানে নয়, রাজত্বে। ইংরেজরা আগেই বিদ্রোহের খবর পেয়ে নৈনিতালে পালিয়ে গেছে। ছাউনি এখন দেশী সেপাইদের দখলে। সেই সঙ্গে বেরেলিসহ গোটা রোহিলা-খণ্ড স্বাধীন। যে রোহিলাখণ্ড ইংরেজদের অধীন ছিলো ১৭৭৪ সাল থেকে।

কিন্তু কার জন্যে ইংরেজরা ভয় পেয়ে পালালো, কে তাদের ছাউনি দখল করেছে?

নামটা জানা যায় এক লহমাতেই,—মুহাম্মদ বখ্ত খান।

সেই সঙ্গেই মেলে তাঁর কিছু পরিচয়ও। যদিও সে পরিচয় তিনি নিজের মুখে দেন না,—দেয় অন্য লোকে, এর ওপর মুখে শুনে।

পরিচয়ের প্রথমটুকু তাঁর বংশের।

সঠিক খবর কেউ জানে না। লোকের শুধু জানা, তিনি রীতিমতো শরীফ ঘরের সন্তান। তাঁর দেহে আছে রাজ বংশের রক্ত। তাঁর জন্ম হয়েছিলো নাকি দিল্লীর মুঘল রাজ বংশে, নয়তো অযোধ্যার নবাব পরিবারে।

কিন্তু জন্ম তাঁর যেখানেই হোক, বাড়ির সাথে সম্পর্ক ছিলো বড়ো কম। তাঁর জীবন কেটেছে বাইরে। ইংরেজদের পল্টনে। তাদের ফৌজে তিনি ঢুকেছিলেন বছর চল্লিশেক আগে, সাধারণ একজন সেপাই হয়ে। যখন তাঁর বয়স পঁচিশের মতো। তারপর থেকে চাকরির খাতিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানান জায়গায়।

পল্টনে তাঁর সুনাম সবার মুখে। তাঁর মতো বীর সেপাই নাকি কমই মেলে। আফগানদের সাথে ইংরেজদের যখন প্রথম লড়াই হয়, তখন তাঁর সাহস দেখে লোকে অবাক মানে। এদিকে, মানুষটা ভারি তেজী আর সৎ।

কিন্তু পল্টনের লোকে তাঁর এতো সুখ্যাতি করলে কি হয়? আসল জায়গায় সব ফাঁকা। ইংরেজরা তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করে না। তাদের

বিচার-আচারও তেমনি। তাই, প্রায় চল্লিশ বছর চাকরি করবার পরও তাঁর উন্নতি হয় সামান্যই। বিদ্রোহের দিন তক তিনি ছিলেন একটা দেশী গোলন্দাজ বাহিনীর তোপখানার একজন ছোটো অফিসার। সুবেদার মেজর।

বখ্‌ত খান বিদ্রোহের জন্যে অনেক দিন থেকেই তলে তলে তৈরি হচ্ছিলেন। বিদ্রোহের দিন দেশী পল্টনের সবাই মিলে তাঁকেই নেতা করে। সেই সঙ্গে তাঁকে একটা প্রমোশনও দেয়। তার ফলে সুবেদার মেজর থেকে তিনি হন ব্রিগেডিয়ার।

লোক সব শুনে আবার বলাবলি করে, ভালো কথা। অচেনা মানুষ সবার কাছে চেনা হলেন। তিনি বেঁচে-বর্তে থাকুন।

ঃ কিন্তু শুধু বেঁচে-বর্তে থাকলেই কি চলবে?

ঃ কেন, আর কি চাই?

ঃ তিনি বিদ্রোহ করলেন,—এই বিদ্রোহ টিকিয়ে রাখতে হবে না?

ঃ তা বটে। ইংরেজরা তো মরেনি—পালিয়ে গেছে। দু'দিন পর যদি হামলা করে?

ঃ হ্যাঁ, তা তো করতেই পারে। এতো দিনের ভোগদখলের জায়গাটা কি তারা সহজে ছেড়ে দেবে?

ঃ তাহলে?

তাহলে যা করবার, তাও বখ্‌ত খান করেন। লোকের সব ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়ে। আর, সেটা লোকে দেখতে পায় চোখের সামনেই। একেবারে মিছিল করে কোতোওয়ালিতে গিয়ে।

সেখানে তখন বিদ্রোহীদের নিয়ে জড়ো হয়েছেন শহরের সব গণ্যমান্য মানুষ। তাঁদের ভেতর আছেন বয়সে আশি বছরের, কিন্তু চেহারায় ঝলমলে নবাব খান বাহাদুর খানও। তিনি রোহিলাখণ্ডের শেষ স্বাধীন নবাব হাফিজ

রহমত আলীর নাতি। ভালো সেতার বাজান। আর কিছু না হোক, সেই কারণেও সবার চেনা, সবার আদরের। এমনিতে সরকারি পরিচয়ে, তিনি বেরেলির সদরুস সুদুর,—সর্দারদের সর্দার।

বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে, এখন থেকে তিনিই হবেন বেরেলির হর্তাকর্তা। সব কাজেই। শুধু নামে থাকবেন দিল্লীর স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌র অধীন। রোহিলাখণ্ডে তাঁর প্রতিনিধি—নবাব নাজিম।

বখ্‌ত খানও চেয়েছিলেন এইটিই। তিনি সবার সাথে মিলে নবাব-নাজিম খান বাহাদুর খানকে ফৌজী সালাম জানান।

তারপরই শুরু হল তাঁর আসল কাজ। বিদ্রোহ টিকিয়ে রাখবার, সদ্য ছিনিয়ে নেয়া স্বাধীনতা পাকা করবার।

নবাব-নাজিম হয়েই খান বাহাদুর খান মন দেন সরকারি কাজকর্ম চালাবার দিকে। একটা মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তিনি।

তখন কথা ওঠে, তাতো আপনি করবেনই। কিন্তু আপনার প্রধান সেনাপতি হচ্ছেন কে?

ঃ তাও কি আবার বলে দিতে হয়?

ঃ মানে, ব্রিগেডিয়ার বখ্‌ত খান?

ঃ অবশ্যই।

একটু পরেই খান বাহাদুর খান ফরমান জারি করে কথাটা সবাইকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেন।

বুড়ো হাড়ের ভেলকিবাজি

প্রধান সেনাপতি হয়েই বখ্‌ত খান লেগে গেলেন কাজে। সে যে কতো রকমের কাজ, তার বুঝি হিসেব নেই।

বিদ্রোহের পর সব জায়গাতেই যা হয়—লোকে আইন-কানুন বড়ো একটা মানতে চায় না—বেরেলিতে তা-ই ঘটে। কিন্তু বিদ্রোহীদের বল বাড়ে না, বাড়ে দুশমনের। তাই, বেআইনী কাজকর্ম, হৈ-হল্লা, হট্টগোল বন্ধ করা দরকার। আর, তার জন্যে ছুটে যান বখ্‌ত খান।

রোহিলাখণ্ডে নানান জাতের লোকের বাস। তাদের মধ্যে এক রাজপুত। তারা রোহিলাদের পুরোনো দুশমন। কিন্তু তারা যদি এখনো দুশমন থাকে, বিদ্রোহ ভেঙ্গে পড়বে. আবার তারা ছাড়াও আছে ব্যবসায়ী আর মহাজনের দল। যারা ইংরেজ আমলে ইংরেজদের দয়ায় বড়ো লোক। আর, তাই মন পড়ে থাকে ইংরেজ মহলে। খান বাহাদুর খানকে এসব দিকে নজর দিতে হয়। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করে কে? বখ্‌ত খান।

বেরেলিতে নতুন সরকার হয়েছে। তার জন্যে চাই অনেক টাকাকড়ি, অনেক লোকজন আর হাতিয়ার। নইলে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না। খান বাহাদুর খান তাই ভাবনায় পড়েন। তখনও বখ্‌ত খানই এগিয়ে যান। বলেন, জঁাহাপনা ভাবনা কিসের? আমি সব ব্যবস্থা করছি।

লোকে তাঁর এমনি সব কাজ দেখে আর অবাক মানে। মনে মনে বলে, এ যে বুড়ো হাড়ের ভেলকিবাজি!

বখ্‌ত খান কিন্তু এসবে খুশী নন। এতো কাজের মধ্যেও তাঁর মন পড়ে থাকে যেন অন্য কোথাও। লোকের হাজার তারিফ শুনেও তাঁর মুখে হাসি ফুটতে চায় না।



আপনার প্রধান সেনাপতি হচ্ছেন কে ! ......বখ্ত খান ?

শেষে তাঁর আশপাশে যাঁরা থাকেন, তাঁরা শুধান : সিপাহ্‌সালার, আপনার কি হয়েছে?

: কই, কিছু না তো!

: তাহলে আপনি অমন মুখ ভার করে থাকেন কেন?

বখ্‌ত খান এবার হেসে ফেলেন : আরে না, না। মুখ ভার করবো কেন? তবে কিনা—মাঝে মাঝে ভাবি, এই যে ইংরেজদের কাছ থেকে এতো টাকা-কড়ি, অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিলাম, এগুলো ভালোভাবে কাজে লাগানো দরকার।

: কেন, ওগুলো কি এখানে কাজে লাগানো যায় না?

: যায়। কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয় কোনো বড়ো জায়গায় গেলে। দিল্লী এখন আমাদের রাজধানী—

: আপনি তাহলে দিল্লী যেতে চান?

: দেখি।

কথা আর এগোয় না কিন্তু বখ্‌ত খান ভাবতে থাকেন।

আর, সেই ভাবনার মধ্যেই নানান রকম খবর আসে তাঁর কানে। দিল্লীতে এখন সব জায়গার বিদ্রোহীরা জড়ো হচ্ছে। লড়াইয়ের জন্যে কখন কোথায় কি করা দরকার, খোদ শাহানশাহ্‌ তাদের বাৎলে দিচ্ছেন। এদিকে, ইংরেজদেরও চোখ পড়েছে দিল্লীর ওপর। দিল্লী এখন নাকি স্বাধীন ভারতের রাজধানী। ইংরেজরা ভাবছে, সব কিছুর আগে রাজধানী দখল করতে হবে। তাহলেই বিদ্রোহীরা কাৎ। সারা দেশ আবার তাদের দখলে আসবে।

বখ্‌ত খান এই সব খবর শুনে মনে মনে বলেন, ইস্‌, একবার যদি দিল্লী যাওয়া যেতো। তাহলে দেখে নিতাম. ইংরেজদের কতোখানি জোর!

এরই মধ্যে তাঁর কথা পেঁাছে যায় দিল্লীতক। এমন কি, শাহানশাহ্ বাহাদুর শাহ্‌র কানেও। তিনি অবশ্যি সরাসরি বখ্ত খানকে ডাক দেন না। কিন্তু দিল্লী যে বার বার ডাকে। সেখানকার বিদ্রোহীরা নাকি তাঁর কামানের আওয়াজ শোনার জন্যে কান পেতে আছে।

বখ্ত খান আর বসে থাকতে পারেন না। নবাব-নাজিম খান বাহাদুর খানের কাছে গিয়ে বললেন, আমায় এবার বিদায় দিন। আমি দিল্লী যাবো।

ঃ সে কি কথা! আপনি চলে গেলে বেরেলিকে দেখবে কে?

ঃ আপনি বীর হাফিজ রহমত আলীর নাতি। বেরেলি—না, শুধু বেরেলি কেন, গোটা রোহিলাখণ্ডের জন্যে আপনিই তো যথেষ্ট।

ঃ কিন্তু, সিশাহ্‌সালার, লড়াই কি শুধু আমি করবো?

ঃ বান্দার অপরাধ নেবেন না, জাঁহাপনা। আমাদের রোহিলাখণ্ড স্বাধীন আজ প্রায় এক মাস। এর মধ্যে যা যা দরকার, আমি তো সাধ্যমতো করেছি। আর যা দরকার হয়,—লোকলস্কর, হাতিয়ার, টাকাকড়ি,—রোহিলাখণ্ডের মানুষই দেবে।

খান বাহাদুর খান আর কিছু বলতে পারেন না।

বখ্ত খান এবার উয্‌যোগ-আয়োজন করতে থাকেন। বেরেলিতে বিদ্রোহ করবার সময় তিনি যা যা পেয়েছিলেন,—সেপাই-সান্ত্রী, কামান-বন্দুক, হাতি-ঘোড়া, টাকা-পয়সা,—সবই নিয়ে যাবেন দিল্লীতে। ক'দিন পরই তিনি রওয়ানা হয়ে পড়েন। বেরেলির লোকজন ভারী বুকে তাঁকে বিদায় দেয়।

সামনে এখন অনেক কাজ

আর, দিল্লী এসেই তিনি হলেন—সে তো আগেই বলেছি,—গবর্নর জেনারেল। সেই সঙ্গে বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতিও। মানে, যুদ্ধের সব কাজ চলবে তাঁরই কথায়।

বাদশাহ্ তার জন্যে তাঁকে সেপাই দরবারেও ঢুকিয়ে নেন।

বখ্‌ত খান এখন মনে মনে ভারি খুশী। এতো দিনে তিনি বড়ো কিছু করবার সুযোগ পেয়েছেন।

এদিকে, পদ পেয়েছেন তিনি বড়ো বড়ো। সেজন্যে তাঁর দায়িত্বও অনেক। বাদশাহ্‌র কাছে আর সেপাই দরবারে বসে তিনি দিল্লীর সব কথাই শুনেছেন। সামনে আযাদী টিকিয়ে রাখবার বিরাট লড়াই। ইংরেজরা এরই মধ্যে দিল্লীর এক কোণে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। তাদের সাথে লড়বার জন্যে এখন লোকজন চাই, টাকাকড়ি চাই, নিয়ম-শৃঙখলা চাই। তার মানে, তাঁর সামনে অনেক কাজ।

এখন তাই বসে থাকবার সময় নেই। তিনি প্রধান সেনপাতি আর বড়োলাট হন দিল্লীতে এসেই। কাজেও লেগে যান সেই দিনই।

আর, তাঁর প্রথম কাজ হয়—লড়াইয়ের জন্যে সবাইকে তৈরি রাখা। বিদ্রোহের একেবারে গোড়ার দিকেই, ১৩ই মে, বাদশাহ্ ফরমান জারি করেছিলেন, লড়াইয়ের জন্যে ভলান্টিয়ার চাই। বাদশাহ্‌র হয়ে যারা লড়তে চায়, তারা হাল-হাতিয়ার নিয়ে চলে আসুক। তাতে লোক জুটেছে অনেক। তবু আরো চাই। বখ্‌ত খান তাই হুকুম দেন, দিল্লীর প্রত্যেকটি মানুষকে হাতিয়ার হাতে নিতে হবে।

লোকে বলে, এতো লড়াইতে যাওয়ার সময়কার কথা। হাতিয়ার কি অন্য সময় আর কোথাও কারো কাছে থাকবে না?

ঃ থাকবে বৈকি। প্রতিটি বাড়িতেই। এমনকি, দোকানেও। মানে, বাড়ির মালিক আর দোকানদারদেরও অস্ত্রশস্ত্র রাখতে হবে।

ঃ কিন্তু যাদের অস্ত্রশস্ত্র নেই, তারা কি করবে?

ঃ তারা এক্ষুণি কোতোওয়ালিতে চলে যাক। সেখানে তাদের বিনি পয়সায় অস্ত্র দেওয়া হবে।

ঃ মানে কিনা—শহরে কারো হাত খালি থাকবে না?

ঃ হ্যাঁ, কাউকেই যেন খালি হাতে দেখা না যায়।

বখ্ত খান যা চান, তা অবশ্যি কাঁটায় কাঁটায় হয় না। তবু ফল মেলে অনেক।

এবার টাকা-পয়সা যোগাড়ের পালা।

কিন্তু সেই টাকা-পয়সা দেয় কে?

কে আবার? যার ঘরে দরকারের চেয়ে বেশি আছে, সে-ই। এই বেশি টাকাওয়ালা লোক হলেন ধনীজন। হাতের কাছে, দিল্লী শহরেই, এমনি ধনীজন আছেন বেশ কিছু। তাঁদের কেউ নবাব কিংবা রইস, কেউ ব্যবসায়ী বা মহাজন।

বখ্ত খান তাঁদের কাছে অনুরোধ জানান, আসুন, আমরা সবাই এক জায়গায় বসি। শহরের অবস্থা নিয়ে একটু আলোচনা করি। তাতেই দেখা যাবে, কে কি দিতে পারেন।

কিন্তু লোকগুলো বড়ো ট্যাড়া। তাঁরা সভায় যাওয়া দূরে থাক, উল্টে ধরেন গ্যাঞ্জামের পথ। বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে বখ্ত খানের নামে নালিশ করেন, মানুষটা সুবিধের নন। মানীর মান রাখতে জানেন না। কোথায়

নিজে এসে হাতে-পায়ে ধরে তাঁদের সভায় ডেকে নিয়ে যাবেন, তা নয়, পেয়াদা দিয়ে হুকুম পাঠান।

বাদশাহ্ অবশ্যি সবই বুঝতে পারেন। টাকা-পয়সা দিতে তাঁরা রাজী নন। মানসম্মানের কথা কেবল এড়িয়ে যাওয়ার ছুঁতো।

বুঝতে পারেন বখ্‌ত খানও। তিনিও তাই চলেন নিজের পথে। আর, সেই পথ হল—একটা কমিটি বানিয়ে দেওয়া। যাতে চৌদ্দজন সদস্য থাকবেন হিন্দু, চৌদ্দজন মুসলমান। কমিটির কাজ দু'রকম। কোন্ টাকাওয়ালার কাছ থেকে কতো টাকা নেয়া হবে তা বলে দেওয়া। সেই সঙ্গে টাকাটা আদায় করাও। এ কমিটি এক-আধ দিনের জন্যে নয়। থাকবে—যতো দিন দরকার।

কমিটি সাধ্যিমতো টাকা-পয়সা তুলতে থাকে।

এরই মধ্যে বখ্‌ত খান ভাবেন আরো কিছু লোকের কথা। যাঁদের কাছে টাকা-পয়সা মিলতে পারে উপরি হিসেবে। মানে, চাঁদা ছাড়াও। সেই টাকা সরকার নেবেন ধার করে। যাঁরা খুব বড়ো বড়ো ধনী, তাঁদের কাছ থেকে।

বিদ্রোহীদের টাকার অভাব তাতেও কিছুটা মেটে।

এরপর তিনি ভাবেন আরো এক পথের কথা। যে-পথে সরকার পেতে পারেন হকের পাওনা।

লোকে বলে, সে আবার কি?

বখ্‌ত খান জবাব দেন, খাজনা।

ঃ ভালো কথা। কিন্তু সেই খাজনা দেবে কে?

ঃ প্রজারা যেসব জায়গার লোকে শাহানশাহ্‌র নাম নিয়ে বিদ্রোহ করেছে, তারা তো এখন তাঁরই অধীন, তাঁরই প্রজা। তারা এবার ইংরেজদের বদলে তাঁকেই খাজনা দেবে।

ঃ তাহলে কি বাদশাহ্ লোক লাগাবেন খাজনা আদায় করতে?

ঃ না। তাঁর হয়ে আমরাই আদায় করবো।

হ্যাঁ, তা-ই তিনি করেন। আশেপাশের সব বিদ্রোহী এলাকায় লোক পাঠিয়ে। তাদের এই কড়া হুকুম দিয়ে যে, তারা হাল খাজনা, বাকি খাজনা দুই-ই আনবে আদায় করে।

লড়াইয়ের জন্যে সবাইকে অস্ত্র নিয়ে তৈরি রাখবার ব্যবস্থা হল। টাকা-পয়সা যোগাড় করবার কিছু ব্যবস্থাও। এখন বাকি নিয়ম-শৃঙখলা।

বখ্‌ত খান তার ব্যবস্থাও করেন। অন্তত যতোটা পারেন।

কিন্তু সবশেষে নয়, অন্য কাজের সাথে সাথেই। ওটাও যে এমন কাজ, যা পরে করবো বলে ফেলে রাখা চলে না। যুদ্ধের সময় আবার ওটা বড়ো বেশি জরুরী। নিয়মকানুন না মানলে, শৃঙখলা বজায় না রাখলে যুদ্ধ জয় করা যায় না। আর, এই নিয়মকানুন, শৃঙখলা চাই কি শুধু ফৌজের জন্যে ? না। যারা সাধারণ মানুষ, ওসব চাই তাদের জন্যেও।

বখ্‌ত খান নজর দেন দু'দিকেই। তিনি ফৌজের সিপাহ্‌সালার। তাই, তাঁর হুকুম হয়, তাঁকে না জানিয়ে সৈন্যসামন্ত কোথাও যেতে পারবে না। এমনকি, লড়াইতেও।

একদিন তো এই নিয়ে মহা হাঙগামা। মীর্জা মুঘল নামে এক শাহ্‌জাদা—বখ্‌ত খান দিল্লীতে আসবার আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি। বখ্‌ত খানের হুকুম শুনে তাঁর গায়ে যেন আগুন ধরে। তিনি বাদশাহ্‌র ঘরের ছেলে। তাঁর ওপর কথা বলেন কিনা—সেদিন তক যিনি ছিলেন ইংরেজদের সুবেদার, সেই বখ্‌ত খান! তিনি ছুটে যান বাহাদুর শাহ্‌র কাছে, এমন হলে তো লড়াই চলে না।

বাদশাহ্‌ শুধান, কেন, কি হয়েছে ?

ঃ এতোদিন আমরা লড়াই করেছি যখন যেমন খুশি। কিন্তু এখন আমাকে বখ্‌ত খানের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়।

ঃ যেমন?

ঃ আজ আমি আমার ফৌজ নিয়ে শহরের বাইরে যাচ্ছিলাম লড়াই করতে। কিন্তু তিনি আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ঃ কেন?

ঃ তাঁর হুকুম নিইনি বলে।

ঃ ও।

তার মানে, মীর্জা মুঘল বুঝে ফেলেন, নালিশটা তাঁর মাঠে মারা গেল।

কিন্তু তাঁরা যেন নাছোড় বান্দা। মীর্জা মুঘলসহ্ সব শাহ্‌জাদা। তাঁদের যেন এক ভাবনা, কেমন করে বখ্‌ত খানকে দমিয়ে রাখা যায়।

শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ একদিন রেগে গিয়ে হুকুম দেন, এখন থেকে সব ক্ষমতা বখ্‌ত খান আর সেপাই দরবারের। তাঁদের ওপর কারো কোনো কথা চলবে না।

এদিকে এই। অন্য দিকেও তাঁকে নিয়ে চলে ঠেলাঠেলি, দলাদলি। যখন তিনি যান শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

আহ্‌সান উল্লাহ্ নামে এক ভদ্রলোক,—তিনি দিল্লী শহরের কোতোয়াল। সবার মাথার ওপর লাঠি ঘোরান। আগে সেপাই দরবারের সদস্যও ছিলেন। কিন্তু তিনি তলে তলে ইংরেজদের দালাল। সেপাইরা তাই সেখান থেকে তাঁকে বের করে দিয়েছে। এখন এই কোতোয়ালগিরিই তাঁর সম্বল। কিন্তু বখ্‌ত খান তাঁর সেই ভাতেও ছাই দেন। তিনি শহরের জন্যে নিয়োগ করেন এক ম্যাজিস্ট্রেট। মুহাম্মদ কুলী খান নামে এক ভদ্রলোককে। জুলাই মাসের ছয় তারিখে।

অমনি আহ্‌সান উল্লাহ্‌ও ছুটে যান বাদশাহ্‌র কাছে ঃ জাঁহাপনা, এমন হলে আমার উপায় কি ?

বাদশাহ্‌ মীর্জা মুঘলের মতো তাঁকেও শুধান, কেন, কি হয়েছে ?

ঃ হয়েছে যে—এই। মুহাম্মদ কুলী খান কি আমাকে আমার ইচ্ছে মতো কাজ করতে দেবেন ?

ঃ কেন দেবেন না ?

ঃ আমার ক্ষমতা কি আর আগের মতো রইলো ? বখ্‌ত খান দিল্লী আসবার পর একটা হপ্তাও যায়নি। এরই মধ্যে এতো কাণ্ড। কেন, আমি কি শান্তি-শৃঙখলা বজায় রাখতে পারছিলাম না ?

ঃ ও, এই কথা।

আহ্‌সান উল্লাহ্‌কেও মুখ চুন করে ফিরে আসতে হয়।

বখ্‌ত খান মনে মনে একটুখানি হেসে আবার নিজের কাজে মন দেন। তাঁর এখন বুঝি নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় নেই।

দলাদলির শিকার

তাঁর সময় নেই। কিন্তু আর সবার তো আছে। যারা শুধু ভাবে, তিনি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, তাদের।

তারা তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারে না। তাই, বার বার তাঁর কাছে হেরে গিয়েও তারা তাঁর বিরুদ্ধে লেগে থাকে।

তাদের নানান দল। কোনো দল শাহজাদা আর নবাবদের, কোনো দল ব্যবসায়ী আর ধনীদের, কোনো দল বা ফৌজের। তার ওপরও রয়েছে দালাল আর দুশমন ইংরেজরা। যে দল যখন পারে, তাঁকে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করে। কখনো একা, কখনো বা অন্য দলের সাথে হাত মিলিয়ে। তাঁকে না দেয় ঠিকমতো শান্তি-শৃঙখলা বজায় রাখতে, না টাকা-পয়সা যোগাড় করতে বা লড়াইয়ের কাজ চালাতে।

সারাটা জুলাই মাস কেটে যায় এমনি করে। কিন্তু দলাদলি, ঠেলাঠেলি কমে না। বরং আরো বাড়ে। বিদ্রোহীদের সবাই চায় দুশমনকে ঝাড়ে-বংশে সাফ করতে। কিন্তু তাদের ভেতর এমন কেউ নেই, যিনি সবাইকে একজোট রাখতে পারেন। অন্যদিকে, প্রত্যেক নেতাই যেন ভাবেন, তিনি আর সবার থেকে বড়ো, তাঁর কথাতেই সবার চলা উচিত। হাল যেখানে এমন, সেখানে দলাদলি তো বাড়বেই।

আর, দলাদলি যতোই বাড়ে, বখ্‌ত খান ততোই তার শিকার হন।

বাদশাহ্ বারবার বলে দিয়েছেন, লড়াই বাবদ টাকা-পয়সা যা যোগাড় করা দরকার, তা বখ্‌ত খানের হুকুমমতোই করা হবে। কিন্তু শাহজাদারা



যার কাছ থেকে মন চায় লড়ায়ের নামে টাকা আদায় করেন।

তা মানেন না। তাঁরা যখন খুশি শহরে বেরিয়ে পড়েন। যার কাছ থেকে মন চায়, লড়াইয়ের নামে টাকা আদায় করেন। আর, তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার, সেই টাকা সরকারের তোশাখানায় জমা দেন না।

বখ্‌ত খান সবই দেখেন।

দেখতে দেখতে—একদিন বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে বলেন ঃ জাঁহাপনা, এর একটা বিহিত না করলে তো চলে না।

বাদশাহ্‌ তাঁর কাছে সব শুনে বললেন ঃ কেন, শাহজাদারা কি জানেন না যে, এটা একদম বেআইনী? এর জন্যে তাঁদের সাজা হতে পারে।

ঃ তাঁরা সবই জানেন। তাছাড়া, মাঝে মাঝে তাঁদের শাস্তিও আপনি দিয়েছেন।

ঃ এবার কে কি করেছেন, বলুন দেখি।

বখ্‌ত খান কয়েকজন শাহজাদার নাম বললেন। তাঁরা সেপাইদের মাইনে দেওয়ার নাম করে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। কিন্তু সেপাইরা সে-টাকা পায়নি।

বাদশাহ্‌ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, আদায়-করা সব টাকা বখ্‌ত খানকে দিয়ে দিতে হবে। পরে যদি কোনো টাকা ওঠে, তাও। একেবারে লোকজনকে সাক্ষী রেখে।

শাহজাদাদের বেআইনী টাকা আদায় এবার বন্ধ। তাতে তাঁদের ভারি অসুবিধা।

তাঁরা তাই ধরলেন অন্য পথ। বখ্‌ত খানের নামে অপবাদ দেওয়ার। তিনি নাকি ইংরেজদের দালাল।

রটনাটা বাদশাহ্‌র কানেও যায়। তিনি অমনি বখ্‌ত খানকে ডেকে পাঠান।

বখ্ত খান তাঁর সামনে গিয়ে বলেন ঃ জাঁহাপনা, আমি এর আর কি জবাব দেব।

ঃ তাহলে আপনার কি কোনো জবাব নেই?

ঃ বেরেলির বিদ্রোহই তো আমার জবাব, জাঁহাপনা।

ঃ কিন্তু তার পরেও তো অন্য কিছু ঘটতে পারে।

ঃ যদি হুকুম পাই, তার জবাবও দিই।

ঃ আমি সেই জবাবই শুনতে চাই।

বখ্ত খান এবার কুরআন শরীফ হাতে তুলে নেন। বলেন, আমার যে কোনো দোষ নেই, তার সাক্ষী এই পাক কালাম।

বাদশাহ্ একটুখানি চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আপনার মতো মানুষের নামেও লোকে কুৎসা রটায়! এ বড়ো দুঃখের কথা।

তখনকার মতো শাহজাদাদের মুখ বন্ধ। কিন্তু তাঁরা একেবারে হাল ছাড়েন না। নতুন সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

আর, সেই সুযোগ পেতেও দেরী হয় না।

বখ্ত খানকে বাদশাহ্ প্রধান সেনাপতি করায় অনেকেরই গা জ্বলছিলো। তাঁরা বখ্ত খানকে কিছুতেই মানতে চান না। বিশেষ করে, বিদ্রোহীদের অন্য সব দলের নেতারা। মানে, যাঁরা এসেছেন বেরেলি ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে। তাঁদের মধ্যে দুজন তো তাঁর নাম শুনলেই ক্ষেপে যান। নিমাখ বাহিনীর নেতা জেনারেল গওস মুহাম্মদ খান আর ব্রিগেডিয়ার শিরধারা সিং। তাঁদের বখ্ত খানের নামে অনেক নালিশ।

একদিন তাঁরা এক নালিশ নিয়ে হাজির হন বাদশাহ্র কাছে। সেই যে বখ্ত খান দিল্লীর আশপাশের বিদ্রোহী এলাকা থেকে খাজনা আদায়ের জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন, নালিশটা সেই বাবদে।

তাঁদের কথা, খাজনা আদায় করতে হবে বিদ্রোহীদের সব দলের সব নেতার মত নিয়ে।

বাদশাহ্ অনেক বুঝিয়ে তাঁদের ঠাণ্ডা করেন।

তবু কিন্তু দলাদলি, ঠেলাঠেলি থামে না। সেই দলাদলি, ঠেলাঠেলি আবার সবার ভেতর। আর, তারও শিকার হন বখ্ত খান।

শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ একদিন সব দলের অফিসারদের তলব করেন। গুনতিতে তাঁরা দেড় শ' জন। তিনি তাঁদের শুধান, আপনাদের দল বড়ো, না কাজ বড়ো?

ঃ কাজ বড়ো।

ঃ আপনারা সেই কাজে শুধু আপন আপন দলের জয় চান, না সব বিদ্রোহীর?

ঃ আমরা সব বিদ্রোহীর জয় চাই, জাঁহাপনা।

ঃ তাহলে এই কোন্দল কেন?

ঃ আমরা দুঃখিত, জাঁহাপনা। আর কখনো এমনটি হবে না। আপনি আমাদের দো'আ করুন।

বাদশাহ্ এবার তাঁদের মাথায় হাত রেখে দো'আ করেন।

তারপর তিনি বিদ্রোহীদের ভাগ করে দেন তিনদলে।

সেই তিনদল থাকে তিন জেনারেলের অধীনে। বখ্ত খান, মীর্জা মুঘল আর গওস মুহাম্মদের অধীনে।

গওস মুহাম্মদের দল তাতেও খুশী নয়। বখ্ত খানের দলের সাথে তাদের ঝগড়া দিনকে দিন বাড়তেই থাকে।

এইবার মওকা বুঝে মীর্জা মুঘল হাত মেলান গওস মুহাম্মদের সাথে। তিনি শাহজাদাদের দলের লোক—নিজেও এক শাহজাদা। তাঁরা সবাই

মিলে আবার রটাতে থাকেন, বখ্‌ত খান ইংরেজদের দালাল। তিনি তাদের সাথে চিঠি লেখালেখি করেন।

এমনি এক মওকা খুঁজছিলো ইংরেজরাও। রটনাটায় তারাও উসকানি দেয়। বিদ্রোহীদের দলে যাতে আরো ভাঙন ধরে, তার জন্যে।

তখন বাদশাহ্‌ আবার বসেন বখ্‌ত খানের বিচার করতে।

আর, সেই বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে আসে এক শিখ বন্দী।

বাদশাহ্‌ দু'পক্ষের কথাই শোনেন। তারপর বলেন, বন্দীর কথার কোনো দাম নেই। ওই ইংরেজদের দালাল, বখ্‌ত খান নন।

তার মানে, বখ্‌ত খান এবারও ছাড়া পেয়ে যান।

কিন্তু একটা জিনিস তিনি আর পান না। সেই যে দিল্লীতে এসে তিনি বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন, সেই পদটি। বিদ্রোহীদের দলাদলি থামাবার জন্যে বাদশাহ্‌ তাদের তিন দলে ভাগ করে তিন জেনারেলের অধীনে দিয়ে দেন। তাঁর সেই হুকুম আর নড়ে না।

লড়াই আর লড়াই

কিন্তু তাঁর দিন কি শুধু দলাদলি, ঠেলাঠেলি সামলাতেই গেল? নাকি টাকা আদায়, লোকলস্কর যোগাড় আর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই? তিনি তো বেরেলি ছেড়ে দিল্লী এসেছিলেন লড়াই করতে। সেই লড়াইয়ের খবর কি?

না, লড়াইও তিনি করেছেন। আর, তার শুরু বলতে গেলে দিল্লী আসবার পর পরই। যখন তাঁর পায়ের ধূলো পায়েই রয়ে গেছে।

তিনি যখন দিল্লী আসেন, তার প্রায় দেড় মাস আগেই ইংরেজ মহলে 'সাজো সাজো' রব ওঠে। বিদ্রোহীদের হাতে মার খেয়ে প্রথম দিকে তারা ঝিম মেরে পড়েছিলো। তার পরই ছুট দেয় দিল্লীর দিকে। দিল্লী তখন বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি,—স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী। এই শহর দখল করতে পারলে অর্ধেক কেল্লা ফতে। ইংরেজরা তাই তার জন্যে চারদিক থেকে সৈন্যসামন্ত গুছিয়ে আনে। এমনকি, বহুত দূরের দেশ ইরান থেকেও।

বিদ্রোহীদের সাথে তাদের প্রথম পাল্টা লড়াই হয় ১৮৫৭ সালের ৩১শে মে। দিল্লী থেকে কিছু দূরে হিন্দান নদীর ধারে। বিদ্রোহীদের হাতে তখন গোলাবারুদ বেশি নেই। প্রাণপণ লড়াই করেও তারা তাই যায় হেরে।

তারপর আস্তে আস্তে ইংরেজরা এসে ওঠে শহরের একেবারে কিনারায়। উত্তর-পশ্চিম দিকে লম্বা এক টিলা,—তার ওপর।

দিল্লীর যখন এমনি হাল, ঠিক তখখুনি বখ্‌ত খান এসে ওঠেন সেখানে। তারিখটা আগেই বলেছি—২রা জুলাই। তারপর দিনই তিনি রওনা হন দিল্লী থেকে কিছু দূরে আলীপুর নামে একটা জায়গার দিকে। তাঁর দলবল নিয়ে।

তা—এমন করে

যাওয়া যে—এই জন্যে। সেখানে ইংরেজদের একটা ঘাঁটি আছে। সেখান দিয়ে তারা পাঞ্জাবে যাওয়া-আসা করে। পাঞ্জাবে তাদের ঘাঁটি আর লোক-লস্কর অনেক। জায়গাটা তাই দখল করা দরকার।

এদিকে, দিল্লীর বিদ্রোহী মহল এর মধ্যে চালু করেছে এক মজার নিয়ম। বাইরে থেকে এখন মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী দল আসছে। নিয়মটা বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে। যেদিন যে নতুন দল আসবে, তার পরদিনই তাদের বেরুতে হবে লড়াইতে। এইটিই তাদের প্রথম কাজ।

সেই সব কথা শুনেই বখ্‌ত খান বলেন, আমি আলীপুর যাবো। জায়গাটা আমাদের দখলে থাকা সত্যিই দরকার। ওটা আমাদের দখলে এলে ইংরেজরা আর পাঞ্জাবের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে না।

তিনি আলীপুর পৌঁছেন চার তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা চলে আসে তাঁর দখলে। তার জন্যে তাঁর একটা গুলীও খরচ হয় না। ইংরেজরা ভয় পেয়ে আগেই ভেগে গেছে।

বখ্‌ত খান ঘাঁটিটায় যা কিছু হাতের কাছে পান, সব গুছিয়ে নিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসেন।

তাঁর আর এক লড়াই দিন পাঁচেক পরই।

কিন্তু এবার আর বাইরে গিয়ে লড়াই নয়, শহরের ভেতরই। দিল্লীর এক বড়ো ধনী হিন্দু রাও। শহরের এক পাশে তাঁর বিরাট বাড়ি। সেই বাড়ি রীতিমতো দুর্গ। সেখানে রয়েছে ইংরেজদের বেশ কিছু সৈন্যসামন্ত। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজদের কাছে বাড়িটার গুরুত্ব অনেক।

এ দিন লড়াই হয় দারুণ। দু'পক্ষেই লোকজন মারা পড়ে বেশ কিছু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা পালিয়ে বাঁচে। বখ্‌ত খানের ফৌজ তাদের অনেক হাল-হাতিয়ার দখল করে নেয়। শুধু কামানই মেলে তেরোটা।

ইংরেজরা এদিন হেরে গিয়ে শোধ নেয় ঘরে ফিরে।

তাদের ছাউনির পাশে এক গীর্জা। লড়াই থেকে পালিয়ে আসা ইংরেজ ঘোড়সওয়াররা দেখে, সেখানে ছোটোখাটো এক ভিড়। সেই ভিড়ের ভেতর রয়েছে মেথর, ঝাড়ুদার, বেয়ারা, বাবুর্চি,—এমনি সব নিরীহ গোছের লোক। সবাই ভারতীয়। আর, ইংরেজদের চাকুরে।

কিন্তু হোক তারা ইংরেজদের চাকুরে। কিংবা নিরীহ। বিদ্রোহীদের জাতভাই তো। তার মানেই বদমাস।

সব ক'জন ঘোড়সওয়ার তাই এক সাথে হুঙ্কার ছাড়ে, ওদের খতম করো।

সঙ্গে সঙ্গে পট পট করে গুলী।

এমনি 'বীর' ইংরেজদের সাথে আর একবার লড়াই হয় হিন্দু রাওয়ের বাড়িতে। দিন পাঁচেক পরই। আর, সেদিনও তারা বিদ্রোহীদের হাতে মার খায় দারুণ।

তারপর কিছু দিন ময়দান একটু ঠাণ্ডা থাকে।

থাকতে থাকতে—জুলাই মাস যেদিন শেষ, সেদিন দিল্লীতে আসে আর এক মস্তো বড়ো বিদ্রোহী বাহিনী। নিমাখ নামে এক জায়গা থেকে। তাদের লোকজন যেমন অনেক, তেমনি অস্ত্রশস্ত্রও।

দিল্লীর বিদ্রোহীরা তাদের দেখে মহাখুশী।

কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে যে কি হয়ে যায়,—তাদের সাথে দারুণ এক ঝগড়া লাগে বখ্‌ত খানেরই বেরেলি বাহিনীর।



এদিন লড়াই হয় দারুণ। ......কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা পালিয়ে বাঁচে।

খবর শুনেই বখ্‌ত খান ছুটে যান ঃ কি হয়েছে, কি হয়েছে?

আর কি হয়েছে। কেউ তাঁর কথা কানেই তোলো না।

তিনি আবার বলেন ঃ ভাইসব, আমরা কি এখানে ঝগড়া করতে এসেছি, না দেশের জন্যে লড়তে?

ঃ কেন এসেছি, তা তো সবাই জানে।

ঃ তাহলে আর নিজেদের ভেতর ঝগড়া বাধিয়ে দুশমনের কাছে দুর্বল হই কেন?

তাঁর চেষ্টায় ঝগড়াটা তখনকার মতো থেমে যায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জের চলতেই থাকে।

তা সে-গল্প এখন থাক। তার আগে বলি আর এক কথা।

নজফগড়ের ফ্যাসাদ

সেকথা নজফগড় নামে একটা জায়গা নিয়ে।

জায়গাটা দিল্লী শহর থেকে একটু দূরে, এক বিলের পাশে। খবর এসেছে, সেখানে ইংরেজরা শক্ত এক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। সেখান থেকে দিল্লীর ওপর হামলা করতে পারে।

খবর শুনে সেপাইরা এ ওকে শুধায়, এখন কি করা?

ঃ কি আবার? ওদের আগে আমরাই হামলা করবো।

ঃ হ্যাঁ, আমরাই আগে ওদের ওপর হামলা চালাবো। এখন তো দলে আমরা অনেক ভারী।

তা ঠিক—দলে সেপাইরা এখন অনেক ভারী। সেই যে নিমাখ বাহিনীর কথা বলছিলাম একটু আগেই—তারা ওই দিনই এসে পৌঁছেছে দিল্লীতে। তাদের পেয়ে বিদ্রোহীদের সে কি উৎসাহ! দিন আট-নয় আগে বখ্‌ত খান বলেছিলেন, মন থেকে যারা লড়াই করতে রাজী নয়, তাদের ফৌজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কে তাড়ায় তাদের? সবাই লড়াইয়ের জন্যে এক পায়ে খাড়া।

পরদিন ইদুল-আযহা। নামাযের পর হিন্দু-মুসলমান সব সেপাই এক গলায় আওয়াজ তোলেঃ আজই আমরা যুদ্ধ দেব, নজফগড় খতম করবো।

তার পরই তারা বীরদর্পে বেরিয়ে পড়ে নজফগড়ের দিকে। দশ-বারোটি কামান সাথে নিয়ে।

কিন্তু—পথে বাদ সাধে পানি। একে বর্ষার বিল টইটম্বুর তার ওপর আকাশ ভেঙে গলগল করে নামে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে সারাটা পথ পুকুর।

আর পুকুরে চুলছেঁড়া স্রোত। সেপাইরা একটা পুল বানায় কামান নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু সেই পুল যেন চক্ষের পলকে ভেসে যায় পানির তোড়ে।

তখন ফিরে আসা ছাড়া আর গতি থাকে না।

কিন্তু যাত্রাটা কি একেবারেই বৃথা যাবে? না, তা কেমন করে হয়? দিল্লীর পাশেই তো টিলা জুড়ে বসে আছে ইংরেজরা। ফেরবার পথে বিদ্রো-হীরা তাদের ওপরই চড়াও হয়। টিলাটা দখল করা না যাক, কিন্তু কামানের গোলা ছুঁড়তে দোষ কি?

দোষ অবশ্যি কিছুই নেই। কিন্তু সেপাইরা নজফগড়ে যেতে পারেনি, তার জন্যে বাদশাহ্‌র মুখ ভার।

বখ্‌ত খানকে তখন পথের সব কথা খুলে জানাতে হয়।

তারপর তিনি বলেন: জাঁহাপনা, বৃষ্টি তো আর রোজ হবে না। নজফ-গড়ের ব্যবস্থা আমরা শিগগিরই করছি।

সেই ব্যবস্থা হল—পঁচিশে আগস্ট। এদিক-ওদিকের ছোটোখাটো কিছু যুদ্ধের পর।

সেদিন নজফগড়ের দিকে বেরুলো পাঁচ হাজার সেপাই। পনেরোটি কামান আর রাশি রাশি গোলাবারুদ নিয়ে। আর, বেরিয়েই নজফগড় দখল।

অথচ সেদিনও এলাকাটা কাদায় পানিতে একাকার হয়ে আছে।

কিন্তু—মন্দ কপাল বলে তো আসলে কিছু নেই, তবু যেন সেই ব্যাপারই হয়ে গেল। তাও আবার সেপাইদের নিজেদের দোষে। মানে, দলাদলির জন্যে।

সেদিনের সেপাইদের দলে ছিলো দুটি বড়ো বাহিনী। একটি বখ্‌ত খানের বেরেলি ব্রিগেড, অপরটি শিরধারা সিংয়ের নিমাখ ব্রিগেড। তারা বেরুলো এক সাথে, একই মকসুদ নিয়ে। কিন্তু কারো সাথে কারো যোগাযোগ না



সেদিন নজফ গড়ের দিকে বেরুলো পাঁচ হাজার সেপাই। পনেরোটি কামান আর রাশি রাশি গোলা বারুদ নিয়ে।

রেখে। যেন এক পথে দুই অচেনা দল চলেছে। তার ফলে তারা শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে গেল। বিশেষ করে, শিরধারা সিংয়ের দল।

নজফগড়ে গিয়ে দুই বাহিনী জায়গাটা দখল করে। কিন্তু এক-এক বাহিনী এক-এক অংশ। এরই মধ্যে এক সময় নিমাখ বাহিনীকে মার্চ করে যেতে দেখে বখ্‌ত খান বলেন ভাইসব, তোমরা একটু দাঁড়াও।

ঃ কেন, দাঁড়াবো কেন?

ঃ এসো, আমরা এক সাথে দুশমনের ওপর হামলা করি।

ঃ না, থাক, তার দরকার নেই। হামলার জন্যে যা দরকার, সবই তো আমাদের আছে।

ঃ তবু এক সাথে লড়াই করা ভালো।

ঃ তোমরা এসবের কি বোঝা? এতো দিন তো শুধু লড়াই-লড়াই খেলা করেছো। দুশমনকে রাজধানীর দরজা থেকে এক চুলও তাই নড়াতে পারোনি।

বখ্‌ত খান দিল্লীতে আসবার পর বড়ো কোনো লড়াই করেননি, করতে পারেননি—এ হল সেই কথা তুলে খোঁটা দেওয়া। খোঁটাটা তাঁর বড়ো গায়ে লাগে। তিনি রাগ করে সরে যান।

সে-ই হল তাঁর ভুল। নিমাখ বাহিনী আর একটু এগিয়ে যেতেই দুশমনদের সামনে পড়ে। তখন শুরু হয় এক তুমুল লড়াই। বখ্‌ত খান জাত সেপাই। বিদ্রোহ করে নেমেছেন ইংরেজদের মুকাবিলায়। কিন্তু তাদের হাতের কাছে পেয়েও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। নিমাখ বাহিনী তাঁর কথা শোনেনি, এর জন্যে।

নিমাখ বাহিনী লড়ে অবশ্যি বীরের মতো। কিন্তু ইংরেজদের জোর

বড়ো বেশি। শেষতক এক হাজার সেপাই আর বারোটি কামান খুইয়ে নিমাখ বাহিনী রাজধানীতে ফিরে আসে।

তাই দেখে দিল্লীর বিদ্রোহীরা যেন চুপসে যায়।

আর, সম্রাট বাহাদুর শাহ্ ওঠেন ক্ষেপে।

বখ্ত খান কিন্তু বলেন, যুদ্ধে হারজিত আছেই। একদিনের হার দেখে ঘাবড়ালে চলবে কেন?

কিন্তু কে শোনে কার কথা? বখ্ত খান ভাবেন, তিনি বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে তাঁকে মানিয়ে নেবেন। কিন্তু তার আগেই বাদশাহ্‌র লোক হুকুম নিয়ে আসে, তিনি যেন শাহী মঞ্জিলে না ঢোকেন।

রাজধানীতে শেষ লড়াই

বাদশাহ্‌র সেই হুকুম শুনে বখ্‌ত খানের বুক যেন ভেঙে যায়। এই বাদশাহ্‌ই মাত্র সপ্তাহ আষ্টেক আগে তাঁকে সব বিদ্রোহীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ করেছিলেন। এখন আবার তাঁরই কাছ থেকে হুকুম আসে, বখ্‌ত খান যেন তাঁর প্রাসাদে না ঢোকেন। এ কি কম দুঃখের কথা!

দুঃখ তিনি পান অন্য দিক থেকেও। তাও ওই নজফগড়ের জন্যেই।

এতো দিন তিনি কোনো বড়ো লড়াই করেন নি। লোকে তাই মাঝে মাঝেই খোঁটা দিতো, উনি কোনো কম্মের নন, যুদ্ধের দিকে মনও নেই। তার পরে ঘটলো নজফগড়ের ব্যাপারটা। সেপাইরা এখন বলাবলি করে, উনি শুধু নামেই জেনারেল। ওঁর কথা আর কে মানবে?

মানে, তাঁর মান-সম্মান বলতে যেন কিছুই থাকে না।

কিন্তু দুঃখের শেষ এই খানেই নয়। একদিকে এই সব, অন্যদিকে তিনি পড়েন এক বিপদে।

বাদশাহ্‌জাদা মীর্জা মুঘল,—বখ্‌ত খান দিল্লীতে আসবার আগে যিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি,—তাঁকে যেন দু'চোখে দেখতে পারেন না। বাদশাহ্‌ তাঁকে পেয়ে মীর্জা মুঘলের জায়গায় তাঁকে প্রধান সেনাপতি বানান, এই কারণে। বখ্‌ত খান অবশ্যি বার বার চেয়েছেন মীর্জা মুঘলকে মানিয়ে নিতে। দিন কতক আগে বাদশাহ্‌কে বলে তাঁকে জেনারেলও বানিয়ে দিয়েছেন। তবু এখন তিনি যেন বখ্‌ত খানের জানের দুশমন।

কিন্তু বখ্‌ত খান সেপাই। তাঁর কি এসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে?

নিজের ভুলও তিনি বোঝেন। দু'দিন পরই তিনি তাই লাগেন সব ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টায়। বলেন, আমি আবার নজফগড়ে যাবো।

যাওয়ার সুযোগও একটা জুটে যায়। যখন তিনি নজফগড়ের খোঁজ-খবর নেন।

জায়গাটায় মাথাওয়ালা লোক আছেন বেশ ক'জন। তাঁদের সবাই জমি-দার। তাঁরা কসম করে বলেন, আমাদের কাছে আপনি সব রকমের সাহায্য পাবেন। শিগগির চলে আসুন।

আশপাশে দুটি বড়ো জায়গা—পানিপথ আর শোনপথ। সেসব জায়গা থেকেও অনেক জমিদার খবর পাঠান, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

বাহাদুর গড় নামে একটা জায়গা। সেখানকার বিদ্রোহীদের নেতা বাহাদুর আলী শাহ্ ঘুরে ঘুরে গ্রামের মানুষদের দলে টানছেন। তিনি খবর দেন, আমরা সবাই আপনার দলে। এমনি খবর আসে আরো নানান জায়গা থেকে।

বখ্ত খান সেই সব খবর শুনে ভাবেন, তাহলে একেবারে অকম্মা তিনি নন। তাঁর ওপর লোকের অন্তত কিছু বিশ্বাস এখনো আছে। তাঁর মনটা আবার খুশিতে ভরে ওঠে। একটু অবসর পেলেই তিনি প্ল্যান করতে থাকেন, কবে কি ভাবে নজফগড়ে যাবেন।

কিন্তু সেখানে যাওয়া তাঁর আর হয় না। কাজ পড়ে যায় শহরেই।

ইংরেজরা অনেক দিন থেকেই রাজধানীর আশপাশে ঘাঁটি গড়ে তুলছিল। সেই সময় মাঝে মাঝেই তারা বিদ্রোহীদের হাতে মার খেয়েছে। দলে এখন তাদের সৈন্যসামন্ত কম। অস্ত্রশস্ত্রও বেশি নেই। অথচ বিদ্রোহীরা প্রায় বেশুমার। তাদের হাতে হাতিয়ারও কিছু কম নয়। ইংরেজদের তাই মার খাওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস আসতেই চাকা যায় ঘুরে। শুধু মার খেতে ইংরেজরা আর রাজী নয়। কাছের দূরের নানান জায়গা থেকে লোকলস্কর আর হাত-হাতিয়ার এনে তারা জড়ো করতে থাকে দিল্লীর আশপাশের ঘাঁটিগুলোয়। কিছু বা শহরের গা-ঘেঁষা জায়গাতেও। মানে কিনা—তারা এখন মরিয়া। যেমন করেই হোক, দিল্লী আবার তাদের দখলে আনতেই হবে। চাই কি—দশ তারিখের ভেতরই।

বিদ্রোহীদের এখন আর অন্যদিকে মন দেওয়ার সময় নেই। তারা ছুটাছুটি করে শুধু দেখে বেড়ায়, শহরটাকে কিভাবে বাঁচানো যায়।

দশ তারিখ তক অবশ্যি ইংরেজরা বিশেষ কিছুই করতে পারে না। যদিও টুকটাক লড়াই চলে মাঝে মাঝেই।

তারপর চৌদ্দ তারিখে তারা শুরু করে প্রচণ্ড হামলা। সেই হামলায় কোনো পক্ষেই কারো চোখে ঘুম থাকে না। খোদ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ও নেমে পড়েন লড়াইয়ের ভেতর। একেবারে খোলা গাড়িতে চেপে। ঠিক লড়াই করবার জন্যে নয়,—সেপাইদের উৎসাহ দিতে।

বখ্ত খানের বুড়ো হাড়েও আবার ভেলকিবাজি চলে। তিনি ছুটে বেড়াতে থাকেন তাজী ঘোড়ার মতো। তাঁকে এই দেখা যায় পথে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে। পরক্ষণেই তিনি সেখান থেকে হাওয়া। আর, একটু পরেই লোকে দেখে, তিনি লড়ছেন কোনো বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে। নয়তো কোনো দেয়ালের মাথায় উঠে। যেন তিনি কসম করেছেন, তাঁর সব অপবাদ ধুয়েমুছে ফেলবেন।

কিন্তু সব বৃথা। ছয় দিনের মাথায় ঘটে এক দারুণ ঘটনা।

বাদশাহ্ বেশ কিছু বিশ্বাসী সৈন্য দিয়ে প্রাসাদটা ঘিরে রেখেছিলেন। বড়ো হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই। ইচ্ছে, সেখান থেকে শেষতক



তিনি ছুটে বেড়াতে থাকেন তাজী ঘোড়ার মতো।

লড়ে যাবেন। কিন্তু ইংরেজদের কিছু দালালের পাল্লায় পড়ে উনিশ তারিখে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান। বলেন, জয়ের ভরসা আর নেই।

বখ্‌ত খান বলেন, জাঁহাপনা, দিল্লী যদি ছাড়তেই হয়, তাহলে চলুন লাখ্‌নৌ যাই। সেখানে এখনো আমাদের অনেক জোর।

কিন্তু বাদশাহ্‌ সেকথা কানে তোলেন না। চলে যান ন'মাইল দূরে কুতুবে।

পরদিন রাতের মধ্যেই দিল্লী আবার চলে যায় ইংরেজদের দখলে।

দিল্লী থেকে বিদায়

রাজধানী হাতছাড়া। বাদশাহ্‌ও সরে গেছেন বিদ্রোহীদের কাছ থেকে। বখ্‌ত খান এবার কি করেন?

আর যা-ই করুন, দিল্লীতে থাকা আর চলে না। শুধু বিদ্রোহীরা হেরে গেছে বলেই নয়। তার থেকেও বড়ো কারণ আছে। ইংরেজরা হন্যে হয়ে ফিরছে বিদ্রোহের নেতাদের ধরবার জন্যে। হাতে পেলেই তাঁদের খতম করে দেবে।

কিন্তু ধরা পড়বার মানুষ বখ্‌ত খান নন। ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েন তিনিও। তাঁর দলের যেসব লোক এখনো টিকে আছে, তাদের নিয়েই।

তা এমন করে সরে পড়া। শুধু কি তাঁর জান বাঁচাবার জন্যে?

না। বখ্‌ত খান বলেন, জান বাঁচানো ফরজ—এতো সবাই জানে। কিন্তু আমি সেপাই। জান আমার কাছে বড়ো নয়!

লোকে বলে, তাহলে বড়ো কি?

ঃ লড়াই।

ঃ আর লড়বেন কোথায়? রাজধানীই তো হাতছাড়া হয়ে গেল!

ঃ কেন, দেশটা কি শুধু রাজধানী নিয়ে? আরো তো কতো জায়গা পড়ে রয়েছে। সেসব জায়গার বিদ্রোহীরা এখনো হার মানেনি।

ঃ তা বটে।

আসলে সেই যে আগেই বলেছি—অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার কথা তিনি ভাবছিলেন বাদশাহ্‌কে পালাতে দেখেই। আর, যুদ্ধের অবস্থা খারাপ দেখে। যদিও উয্‌যোগ-আয়োজন করবার সময় তখন ছিলো না।

কিন্তু এখন উয্‌যোগ-আয়োজন করতে হয়।

আর, সেসব করতে গিয়েই তাঁর মনে পড়ে বাদশাহ্‌র কথা। তাঁকে মাথার ওপর রাখতে পারলে অনেক লাভ। তাঁর নাম করে বিদ্রোহীদের একজোট করা সহজ হবে। তাছাড়া, এই বিপদের দিনে তাঁকে একলা ফেলে রেখে যাওয়াটা কি উচিত ?

তবে, চাইলেই তো তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আগে তাঁকে রাজী করানো দরকার। একবার তো তিনি কথা শোনেন নি। এদিকে দালালরা এখনো তাঁকে ঘিরে রয়েছে। আর, সেই দালালদের একজন বড়ো দড়ো। বাদশাহ্‌র আদরের ছোটো বেগম জীনাত মহলের বাবা মীর্জা এলাহী বখ্‌শ।

বখ্‌ত খান তবু চেষ্টা-চরিত্তির করে বাদশাহ্‌র সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দিল্লী যেদিন হাতছাড়া হয়, তার পরদিন।

বাদশাহ্‌ তাঁকে দেখে শুধান, আবার কি বখ্‌ত খান ?

ঃ আগেই তো বলেছি, জাঁহাপনা। এর মধ্যে আরো কিছু খবর নিলাম। অযোধ্যা আর রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহীদের এখন খুব জোর। আপনাকে কাছে পেলে তাদের জোর আরো বেড়ে যাবে। এদিকে এখানে রসদের বড়ো অভাব।

ঃ আমাকে কি তাহলে শুধু তাদের জোর বাড়াবার জন্যেই ওদিকে যেতে হবে ?

ঃ বেয়াদবি মাফ করবেন, জাঁহাপনা। যাওয়া দরকার আপনার নিজের জন্যেও।

ঃ কি রকম?

ঃ জীবনের বাকি ক'টা দিন আপনি নিশ্চয়ই মান-সম্মান নিয়েই কাটাতে চান। কিন্তু এখানে থাকলে সেটা সম্ভব নাও হতে পারে।

ঃ কেন?

ঃ এখানে গাদ্দার বড়ো বেশি। তারা আপনাকে যে কোনো সময় বদমাস ইংরেজের হাতে তুলে দিতে পারে। তখন আপনার অপমানের শেষ থাকবে না।

বাদশাহ্ বলেন—না, এই বয়সে অপমান হতে আমি আর চাইনে। আপনাদের কথায় আমি রাজী।

কিন্তু তিনি রাজী হলে কি হবে? তাঁকে আগলে রেখেছে এক শকুনি। তাঁরই শ্বশুর—ছোটো বেগমের বাবা মীর্জা এলাহী বখ্শ। ইংরেজদের সবচেয়ে বিশ্বাসী দালালদের একজন। তিনি চান বাদশাহ্কে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে। বাদশাহ্র মুখে আবার পালাবার কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। মেয়েকে সাথে নিয়ে লাগেন উলটো কিছু কথা বোঝাতে।

তা সেই সব কথা কি? না, বাদশাহ্কে হাতে পেলেও ইংরেজরা জানে মারবে না। শুধু এই কথাটা বললেই যে, তিনি নিজের ইচ্ছেয় লড়াইতে নামেননি। বিদ্রোহীরা তাঁকে জোর করে নামিয়েছিলো। এই বয়সে আর নতুন ঝামেলায় না গিয়ে এমনিভাবে জান বাঁচানোই ভালো। তাছাড়া, অযোধ্যা রোহিলাখণ্ডে গেলেই যে যুদ্ধে জয় হবে, তারও তো কোনো ঠিক নেই।

এমনি আরো কতো কি!

আর, সেইসব কথা শুনে বাদশাহ্র মন টলে ওঠে।

কিন্তু বখ্ত খান নাছোড় বান্দা। তিনি বাদশাহ্কে আবার বোঝান।

তখন বাদশাহ্ও আবার বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে।

ঃ তাহলে কাল হুমায়ূন শাহ্‌র কবরগাহে জাঁহাপনার সাথে দেখা হবে।

বখ্‌ত খানের বড়ো তাড়া। বাদশাহ্‌কে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে। তিনি বেরিয়ে এলেন।

অমনি এলাহী বখ্‌শও আবার লেগে গেলেন তাঁর মতলব হাসিলের চেষ্টায়। নাছোড় বান্দা তিনিও।

শেষ পর্যন্ত জয় হয় তাঁরই। বাদশাহ্‌ তাঁর কথায় প্রথমে গিয়ে ওঠেন তাঁর বাড়িতে। ছোটো বেগম আর ছোটো ছেলেকে নিয়ে। তারপর ২১শে সেপ্টেম্বর, ভাঙাচোরা এক বাড়ি থেকে ইংরেজদের হাতে ধরা দেন। শত শত মানুষের সামনে।

বখ্‌ত খান সবই শোনেন। শুধু সামনে গিয়ে কিছু করতে পারেন না।

তাঁর একটা বিরাট আশা শেষ হয়ে গেছে। এখন যেন বুকখানা ফেটে যেতে চাইছে। তিনি ভিজে চোখ মেলে দিল্লীর দিকে চেয়ে থাকেন।



২১শে সেপ্টেম্বর বাহাদুরশাহ ধরা পড়লেন ইংরেজদের হাতে। সাথে ছোট বেগম আর শাহজাদা।

মথুরা-কানপুর-লাখ্নৌ

কিন্তু আবার তিনি সামনে নেন। তিনি যে সেপাই।

নিজের বাহিনীতে ফিরেই তিনি বলেন, এখানে আর একটা দিনও নয়। যতো শিগগির পারা যায়, নতুন ময়দানের দিকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

বাহিনীর সেপাইরা বলে, আপনি যেখানে যেতে হুকুম করবেন, আমরা সেখানেই যাবো।

ঃ সাবাস! এই তো চাই।

ঃ তাহলে আমরা অযোধ্যা বা রোহিলাখণ্ডে কবে যাচ্ছি?

ঃ তোমরা তো জানো, শাহানশাহ্‌কে নিয়ে আমি ওই দিকেই যেতে চেয়েছিলাম। এখনো তা-ই চাই। তবে কিনা—

ঃ বুঝেছি। যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই।

আর কথা নয়। বখ্‌ত খান তাড়াতাড়ি হয়ে নেন।

তারপর দুশমনদের চোখে ধূলো দিয়ে ধরেন পূর্ব-দক্ষিণের পথ।

সেই পথ কিন্তু রোহিলাখণ্ডে বা অযোধ্যায় শেষ হয় না। তাঁকে নিয়ে যায় দূরে-দূরে-আরো দূরে। অনেক এঁকে-বেঁকে। নইলে দুশমনের হাত এড়ানো যায় না, লড়াইয়ের পছন্দসই নতুন ময়দান মেলে না।

শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়ে ওঠেন মথুরায়। অনেক বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে, অনেক অনেক কষ্ট করে।

মথুরা তখন বিদ্রোহীদের তেমন কিছু বড়ো ঘাঁটি নয়। কিন্তু জায়গাটার দাম অনেক। ওটা দখলে রাখতে পারলে ইংরেজদের পূর্ব-পশ্চিমে খুশি মতো চলাফেরা অনেকখানি ঠেকানো যায়।

বখ্‌ত খানকে পেয়ে মথুরার বিদ্রোহীরা তাই যেন নেচে ওঠে।

কিন্তু মথুরায় বিশেষ সুবিধা করা গেল না। ছোটো জায়গা তো। তার লড়াই বলতে গেলে দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়। আর, সেই লড়াইতে বিদ্রোহীদের হার হয়।

বখ্‌ত খান এবার কি করবেন?

সঙ্গীরা তাঁর কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন, কি করবো, তা তো জানাই আছে। দিল্লী থেকে বেরিয়েছিলাম—সে তো মথুরায় আসবার জন্যে নয়।

ঃ তা তো জানি।

ঃ তাহলে ধরে নাও না, মথুরার ব্যাপারটা নেহাৎই পথের ঘটনা। পথ আমাদের এখনো ফুরোয়নি।

ঃ বেশ, চলুন এবার যেখানে যেতে চান।

মথুরা থেকে বেরিয়ে তিনি রওয়ানা হন কানপুরের দিকে।

কানপুর এখন বিদ্রোহীদের এক বড়ো ঘাঁটি। এখানে ঘোরাঘুরি করছেন তাদের বেশ কয়েকজন বড়ো নেতাও। তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব এবং আরো কেউ কেউ। বিদ্রোহের গোড়ার দিকে ইংরেজরা কানপুরে বড়ো রকমের মারও খেয়েছিলো। অনেক ইংরেজ মারা যায় এখানে। তখন জায়গাটা ছিলো তাদেরই এক বড়ো ঘাঁটি।

তাদের তাই কড়া নজর কানপুরের ওপর।

বখ্‌ত খান ভাবে, এখানে লড়াইটা জমবে ভালো।

জমেও। মাস আড়াই আগে একবার হেরে যাওয়ার পর আবার বিদ্রোহীরা খাস কানপুরে জড়ো হয়েছে। সময়টা কনকনে শীতের। তবু

তাদের উৎসাহের অন্ত নেই। বিশেষ করে এই জন্যে যে, ইংরেজদের হা...
এখন একটু নাজুক। তারা লাখ্নৌর কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ফৌজে সৈন্য
সামন্তও খুব বেশি নেই।

কিন্তু হঠাৎ কলকাতা থেকে তাদের বেশ কিছু সৈন্য এসে পড়ে। তার পরই শুরু হয় তুমুল লড়াই।

দুঃখের বিষয়, সেই লড়াইতে হার হয় বিদ্রোহীদের।

বখ্ত খান এবার পাড়ি জমান লাখ্নৌতে। হাত মেলান নতুন নতুন বিদ্রোহীদের সাথে।

লাখ্নৌ এখন বলতে গেলে বিদ্রোহীদের শেষ বড়ো ঘাঁটি। আর এখানেও আছেন তাদের বেশ কয়েকজন বড়ো নেতা। বিশেষ করে, বেগম হজরত মহল। লাখ্নৌ তাঁর নিজের শহর। কিছু দিন আগেও তিনিই ছিলেন এখানকার রানী। এখন তাঁর নাবালক ছেলে নবাব বিরজিস কাদিরের অভিভাবিকা।

এখানে লড়াই হয় ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। কিন্তু এর মধ্যে প্রায় সব জায়গার লড়াইতেই ইংরেজদের জয় হয়েছে। লোকলস্করও অনেক। তাদের তাই বুকে বড়ো বল। লাখ্নৌয়ের লড়াইতেও বিদ্রোহীদের হার হয়।

বখ্ত খান তবু নাছোড়বান্দা। তিনি যে কসম করেছেন, যতোক্ষণ জান আছে, দুশমনকে ছেড়ে কথা কইবেন না।

তিনি তাই আবার বেরিয়ে পড়েন পথে। আর, সেই পথে চলে শু... লড়াই আর লড়াই। কোথাও ছোটো, কোথাও বড়ো।

তাঁকে শেষবার বড়ো লড়াইয়ে দেখা যায় শাহজাহানপুরে। বিদ্রোহে...

দুই তাজা আগুনের শিখা শাহজাদা ফিরোজ শাহ্ আর মৌলবী আহমদ উল্লাহ্‌র সাথে।

ততো দিনে বিদ্রোহ প্রায় থেমে এসেছে। অনেক নেতাই দুশমনের হাতে বন্দী। মারা পড়েছেন আর ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছেন বহুজন। আর, কেউ কেউ গা-ঢাকা দিচ্ছেন নেপালের জঙ্গলে। যদি সেখানে থেকে আবার লোক-লস্কর আর টাকাকড়ি যোগাড় করে লড়াইতে নামা যায়, এই আশায়।

বখ্‌ত খান দিন কতক ভাবেন। তারপর একদিন তিনিও গিয়ে ঢোকেন নেপালের জঙ্গলে। পোশাক-টোশাক পাল্টে ছদ্মবেশে, এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে।

শেষ আলোর দিনগুলো

তিনি জঙ্গলে এসে ঢোকেন। কিন্তু মন খালি আনচান করে। এখানে তিনি এসেছেন নতুন লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে। আর সবার সাথে হাত মিলিয়ে লোক-লস্কর আর টাকা-কড়ি যোগাড়ের চেষ্টাও চলছে। তবু বার বার মনে হয়, কি যেন নেই কি যেন চাই।

সঙ্গীরা সবই দেখে। দেখতে দেখতে একদিন জিজ্ঞেস করে, আপনার কি হয়েছে ?

ঃ যা হওয়ার নয়—

ঃ মানে ?

ঃ যার জন্যে এখানে আসা, তা হবে না।

ঃ তাহলে আর যুদ্ধ করবেন না ?

ঃ করবো বৈকি। তবে কিনা—এখান থেকে নয়। এখানে পড়ে থাকলে আর কোনো দিনই যুদ্ধ করা হবে না।

ঃ যুদ্ধ তো আমরা এখানে করবো না,—তৈরি হয়েই ময়দানে গিয়ে দাঁড়াবো।

ঃ জঙ্গলে বসে সেই তৈরি হওয়াও সম্ভব নয়। তার জন্যেও মান্‌যিলে যাওয়া দরকার।

হ্যাঁ, ওই মান্‌যিলে যাওয়ার জন্যেই তাঁর মন আনচান করছিলো। যদিও এখন জঙ্গল থেকে বেরুনোর মানে যমের মুখে পড়া। লড়াই এখনো অনেক জায়গাতেই চলছে বটে। কিন্তু বড়ো রকমের কিছুই নয়। বিদ্রোহীদের পায়ের তলায় কোথাও শক্ত মাটি নেই। দেশের প্রায় সব জায়গাই আবার চলে গেছে



তিনি জঙ্গলে এসে ঢোকেন। কিন্তু মন খালি আনচান করে।

ইংরেজদের দখলে। আর, তারা এখন মনের সুখে চালাচ্ছে জুলুম। বিদ্রোহ থামাবার নামে বদলা নিতে। রোজ কতো মানুষের যে তাদের হাতে জান যাচ্ছে, তার হিসেব নেই।

কিন্তু বখ্‌ত খান অটল। বাইরে তিনি যাবেনই। সঙ্গীরা কতো মানা করে, অন্য নেতারা কতো বোঝান। কিন্তু তিনি কিছুই মানেন না। তাঁর মুখে শুধু ওই এক কথা, আমি বাইরে গিয়ে লড়বো। সেখানে এখনো কতো মানুষ লড়ছে। আমি গিয়ে দাঁড়াবো তাদের পাশে।

তা—দাঁড়ানও।

তাও কি এক জায়গায়? ওই যে—একটু আগেই বলছিলাম. বিদ্রোহীদের তখন কোথাও পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই,—তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় এখান থেকে সেখানে। একদিন এক ময়দানের লড়াইয়ে হার হয়। পরদিনই জয়ের আশায় ছুটে যান আর এক ময়দানে। দুশমনও বার বার তাঁর পিছু নেয়, বার বার বন্দুক তাক করে তাঁর দিকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে কতো লড়াই-ই তিনি করেন।

কিন্তু সব বৃথা। তাঁর বড়ো সাধ, দুশমনকে খতম করে দেশে আবার আযাদীর নিশান ওড়াবেন,—সেই সাধ কিছুতেই মেটে না।

তারপর একদিন তিনি হারিয়ে যান। তাঁর কোনো খবরই মেলে না।

কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? যাঁর শুধু এক ভাবনা—দেশের আযাদী,—তিনি কি একেবারে হারিয়ে যেতে পারেন? কখ্‌খনো না। আর, লোকে তাই কান পেতে রাখে তাঁর খবর শোনার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত খবর তারা শোনেও। তবে, সেটা চোখ ভেজানো। তিনি শহীদ হয়েছেন। লাখ্‌নৌয়ের কাছে এক লড়াইয়ের ময়দানে। বেরিলিতে আগুন জ্বালাবার প্রায় দু'বছর পর, ১৮৫৯ সালের ১৩ই মে।

তাকে ভেজা চোখ নিয়ে শোনে আরো এক খবর। নেপাল থেকে ফেরবার পর লড়াই তিনি একটি দিনের তরেও ছাড়েননি, দুশমনের কাছে মাথা নোয়াননি হাজার কষ্টের ভেতরও।

সেই কথা শুনে তারা মনে মনে বলে, বখ্‌ত খান, তুমি মরেও অমর। তোমাকে সালাম।

তাঁকে সালাম জানাই আমরাও।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ